সংবিধান সংশোধন, বিচারপতিদের অভিশংসন ও এর সম্ভাব্য তাৎপর্য

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (০১/০৯/২০১৪)

গত ১৮ আগস্ট মন্ত্রিসভা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬(২) অনুচ্ছেদ সংবিধানে পুনঃস্থাপিত হবে। এর ফলে বর্তমান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে'র বিধান বাতিল হয়ে যাবে এবং সংসদ উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা ফেরত পাবে। সংসদের ১ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠেয় অধিবেশনেই এই সংশোধনী পাশ হবে এবং এটিকে কার্যকারিতা প্রদানের লক্ষ্যে আগামী তিনমাসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে বলেও সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে (*প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০১৪)।

মাননীয় আইনমন্ত্রীর মতে, প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তো ক্ষুণ্ন করবেই না বরং এর সুফল জনগণ পাবে। মাননীয় সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের মতে, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। পক্ষান্তরে পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগ সরকারের কাছে নতজানু হতে বাধ্য হবে এবং এর বিরূপ প্রভাব অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানেও পড়বে। বস্তুত এর মাধ্যমে সরকারের পক্ষে আরও কর্তৃত্ববাদী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

স্বাধীনতা উত্তর সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধানের প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক। বিশেষত প্রাসঙ্গিক সংবিধানের ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ। এই পাঁচটি অনুচ্ছেদ যথাক্রমে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, বিচারকের পদের মেয়াদ ও অপসারণ, বিচারকগণের অক্ষমতা, অধস্তন আদালতে নিয়োগ এবং অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, বাহাত্তরের সংবিধান রচনার পর, এইসব অনুচ্ছেদে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো:
(টেবিলটি পেপারের সবশেষে যুক্ত)

টেবিলে প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়েছে এসব অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে বাহাত্তরের সংবিধানের মূল বিধান। এরপর চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ের মাধ্যমেও এসব অনুচ্ছেদে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যা পরবর্তী কলামে স্থান পেয়েছে। এর পরের কলামে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। গত ৪২ বছরের পরিবর্তনগুলো মোটাদাগে নিম্নরূপ:

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে

- উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বিধান রহিত করা হয় [৯৫(১) অনুচ্ছেদ]।
- সংসদের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির কাছে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় [৯৬(২) অনুচ্ছেদ]।
- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধস্তন আদালতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার বিধান রহিত করা হয় [১১৫(১) অনুচ্ছেদ]।
- অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করা হয় (অনুচ্ছেদ ১১৬)
- বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা হয় (অনুচ্ছেদ ১১৬ক)।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (দ্বিতীয় সামরিক ফরমান) দ্বারা ১৯৭৮ সালে

- সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার বিধান সংযোজন করা হয় [অনুচ্ছেদ ৯৫(২)(গ)]।
- সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা হয় [অনুচ্ছেদ ৯৬(৩)]।
- অতিরিক্ত বিচারক পদ ব্যতীত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালনের শেষে অবসর বা অপসারণের পর আদালত বা কর্তৃপক্ষের ওকালতি বা কার্য করবেন না – এই বিধানের সঙ্গে 'বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত' এবং 'লাভজনক পদে' শব্দগুলো সংযোজন করা হয় [৯৯(১) অনুচ্ছেদ]।
- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হবার পর আপিল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করতে পারার বিধান সংযোজন করা হয় [৯৯(২) অনুচ্ছেদ]।

- অধস্তন আদালতসমূহের ওপর রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার বিধান যুক্ত করা হয় (অনুচ্ছেদ ১১৬)।

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী দ্বারা ১৯৮৬ সালে বিচারপতিদের বয়স পয়ষট্টিতে বৃদ্ধি করা হয়।

সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে ৯৯ অনুচ্ছেদে 'আধা-বিচার বিভাগীয় পদ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'আধা-বিচার বিভাগীয় পদ অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হয়।

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী দ্বারা ২০০৪ সালে বিচারপতিদের বয়স সাতষট্টিতে বৃদ্ধি করা হয়।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিচারপতিদের নিয়োগ সম্পর্কিত *সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮* জারি করা হয়, যা নবম জাতীয় সংসদ অনুমোদন করেনি।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে

- সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (দ্বিতীয় সামরিক ফরমান) দ্বারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সংশোধনীসমূহ বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ফলে উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করার বিধান রহিত হয়ে যায় [অনুচ্ছেদ ৯৫(১)]। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার বিধান বাতিল হয়ে যায় [অনুচ্ছেদ ৯৫(গ)]। অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধিত সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল হয়।
- সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (দ্বিতীয় সামরিক ফরমান) দ্বারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সংশোধনীসমূহ বেআইনি ঘোষণা করা হয়। তবে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধানকে মার্জনা করা হয়, যার ফলে ৯৬(২) অনুচ্ছেদ মূলত পুনর্বহাল হয়।
- অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা সম্পর্কিত বাহাত্তরের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল হয়। অর্থাৎ বিচারপতিরা অবসর গ্রহণ বা অপসারণের পর প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ পাওয়ার অযোগ্য হয়ে যান।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে

- উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বিধান পুনর্বহাল করা হয় [অনুচ্ছেদ ৯৫(১)]।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার বিধান পুনর্বহাল করা হয় [অনুচ্ছেদ ৯৫(গ)]।
- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে অবসর গ্রহণের হবার পর আপিল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করতে পারার পঞ্চম সংশোধনী কর্তৃক সংযোজিত বিধান পুনর্বহাল করা হয় [৯৯(২) অনুচ্ছেদ]। তবে 'অপসারিত হইবার' শব্দগুলো বাদ দেওয়া হয়।
- (লক্ষণীয় যে, অধস্তন আদালতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়নি (সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ)।

ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফেরত দেওয়ার বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে [বাহাত্তরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬(২)]।

ষোড়শ সংশোধনী ও তার তাৎপর্য

গণমাধ্যমের সুবাধে আমরা যতটুকু জেনেছি, সংবিধানের প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬(২)অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা সম্প্রতি অনুমোদন করেছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে বিদ্যমান সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান বাতিল হয়ে যাবে এবং উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হবে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯৫, ৯৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদে অন্য কোনো পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকের মনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অপসারণের ক্ষেত্রেও উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের পদ্ধতিই প্রযোজ্য। উদারণস্বরূপ, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(৫) অনুযায়ী, 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার

অপসারিত হইবেন না।' এমনিভাবে মহা হিসাব নিরীক্ষক এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সংবিধানের ১২৯(২) ও ১৩৯(২) অনুচ্ছেদের বিধানও একই।

এমনকি সংসদ কর্তৃক আইনের দ্বারা সৃষ্ট বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪*-এর ১০(৩) ধারা অনুযায়ী, 'সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোন কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।' অনুরূপ বিধান রয়েছে *তথ্য কমিশন আইন, ২০০৯*-এর ১৬(১) এবং *জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯*-এর ৮(১) ধারায়। অর্থাৎ মনে হয় যেন সরকার এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী সরকারের একটি বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী নিবর্তনমূলক স্কিমেরই অংশ।

বস্তুত, সংবিধানের প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনী আমাদেরকে ট্রয়ের ঘোড়ার উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনী অনেকেরই জানা। দীর্ঘ দশবছর অবরোধ করে রাখার পরও ট্রয় নগর দখল করতে না পেরে গ্রীক বাহিনী একটি প্রতারণার আশ্রয় নেয়। বড় একটি কাঠের ঘোড়া বানিয়ে ঘোড়ার ভিতরে কিছু সৈন্য লুকিয়ে রেখে মূল গ্রীক বাহিনী সমুদ্র পথে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার ভান করে। ট্রয়বাসীরা দীর্ঘ যুদ্ধের অবসানে আনন্দিত হয়ে কাঠের ঘোড়াটিকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করে নগরের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। রাতের বেলা সৈন্য ঘোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নগরের গেট খুলে দেয়, যে গেট দিয়ে মূল গ্রীক বাহিনী ট্রয় নগরে প্রবেশ করে অতর্কিত হামলার মাধ্যমে তা দখল করে নেয়। এভাবে কারসাজির মাধ্যমে গ্রীকরা ট্রয় নগরী দখল করে নেয়।

বর্তমান সরকারও মনে হয় যেন এমনই একটি কারসাজির আশ্রয় নিয়েছে। বিচারপতিদের অভিশংসন সংক্রান্ত বাহাত্তরের সংবিধানের বিধান পুনর্বহাল করার মত একটি ইনোসেন্ট ও অনেকের কাছে আপাত যৌক্তিক একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার সব সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাথার ওপর একটি ভয়াবহ খড়্গ টানানোর পাঁয়তারায় লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে দেশে একটি কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচিত হবে এবং বিচারপতিদেরকে অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে হস্তান্তর করা এক্ষেত্রে ট্রয়ের ঘোড়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই অনেকের আশঙ্কা।

অভিশংসনের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত

সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে সরকার সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারপার্সন ও জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারপার্সন করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার শরিক দলের প্রায় সব জ্যেষ্ঠ নেতারা যার সদস্য ছিলেন। কমিটি ২৭টি বৈঠক করে এবং তিনজন প্রধান বিচারপতি, দশজন আইনজীবী/বিশেষজ্ঞ, আওয়ামী লীগসহ ছয়টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি (যার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল এরশাদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন), ১৮ জন বুদ্ধিজীবী, ১৮ জন সম্পাদক এবং সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের মতামত গ্রহণ করে।

কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. এম জহির বলেন: '... It is our earnest hope that Articles 115 and 116 of the Constitution will be restored to their original position by the Parliament as soon as possible ...We hope Parliament will have to take steps, active steps, positive steps ... আর সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে এটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় না কারও দ্বিমত আছে।'

কমিটির ১৮তম বৈঠকে বিচারপতি, আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞগণ বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের মতামত দেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন: ' ... কারো কারো চিন্তাধারায় এটা আছে যে অরিজিনাল সংবিধানে অভিসংশনের যে পাওয়ার এটা পাওয়ার রি-স্টোর করলে ভালো হয়। আমি বিনীতভাবে কয়েকটা কথা নিবেদন করব। মার্শাল' ল যদি কোন ভালো কাজ করে থাকে তাহলে এই 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' করেছে। কারণ, প্রিন্সিপাল অব জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে যে, no one should be judged other than by (his) own peers. নিজের সহধর্মী বা সহকর্মী ছাড়া অন্য কারো দ্বারা তার বিচার করা ঠিক নয়। এটিই হচ্ছে জুরিসপ্রুডেন্স ... এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে একটু শক্তিশালী করুন। এটা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি হিসেবে এর কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করুন যাতে কোন উড়ো কথা যেন আমার কানে না আসে, আমার কানে যেন হার্ড এভিডেন্স আসে, যাতে আমি একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি। আপনি যদি অভিশংসনটা সংসদে দিয়ে যান তাহলে কিছু করতে পারবেন না ... সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে কোন রকম ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম প্রভাইড করতে চেষ্টা করুন ... আমার জজ সাহেব ঘুষ খান, আমার জজ সাহেব পয়সা নিয়ে জাজমেন্ট লিখেন, আমি এই খবরগুলোর জন্য কি সিআইডির কাছে যাব, ডিআইবির কাছে যাব। এর জন্য আলাদা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি করতে হবে। তদারকি সেল যেটাকে বলা হয়। এই তদারকি সেলটা দেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে একটু শক্তিশালী করুন। কিন্তু এটা সংসদে আনবেন না প্লিজ।'

সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহমুদুল ইসলাম বলেন: '... সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, আমরা দেখেছি, এর কার্যকারিতা কিছুই নেই বলতে গেলে। এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, পেপারে অনেক সত্য কথা এসেছে কিছু কিছু জাজ সম্বন্ধে। কোন নড়চড় নেই। ওই পিএসদের দিয়ে জজদের accountabilty maintain করা সম্ভব নয়। অন্যান্য দেশে যেটা আছে, সেটাই আসতে হবে। তবে এর সঙ্গে আরেকটা কথা আছে। আমাদের যে পরিস্থিতি, তাতে আমাকে মাফ করবেন, এইরকম পার্লামেন্টে জাজদের এবং অন্যান্য যারা আছে তাদের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া, সে সম্বন্ধেও আমরা আতংকিত। এই অবস্থায় আমরা যদি আবার পুরা ফিরে যাই, তাহলে বলবো, independence of judiciary will be at stake. এখন কোনভাবে কোন আইন করা যায় কিনা, যাতে কতগুলো fundamental rules establish করা যায়। criteria, transparency নিয়ে আসা, যাতে কোন জজ victimize না হয়। ...Judge-দের behaviour-এর ও প্রশ্ন আছে। এমন judge আছেন, যারা এমন behave করেন which amounts to misconduct. তার কোন ব্যবস্থা নেই। আবার জাজ এমনই হয়েছেন যে, তাদের নিজেদের dignity কী তাই জানে না। গাড়ি থেকে নেমে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করেন। ... ফলে accountability of the judges সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে।' তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় পালাক্রমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিচারপতিদেরকে অভিশংসনের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মোঃ ফজলুল করিম বলেন: .'... একটি strong judiciary যদি না থাকে তাহলে দেশের ভীত সব সময় নড়বড়ে থাকবে। সুতরাং both regarding appointment of judges, selection of judges সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। সেই নীতিমালাকে যদি আমরা ফলো করি তাহলে মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানটা খুব সুনাম বয়ে আনবে। অতীতে আমাদের খুব সুন্দর একটি Institution ছিল। আমাদের জুডিশিয়ারী সম্পর্কে এই সাবকন্টিনেন্টে সবাই appreciate করত ... একটি সুপ্রিম জুডিশিয়ারী কাউন্সিল থাকাটা খুবই ভাল দিক। other than জিনিসটা পার্লামেন্টকে দিতে পারলে খুবই ভাল। কিন্তু পার্লামেন্টের ব্যাপার হচ্ছে যে, অনেকে অনেক সময় অপরাধের গুরুত্বটা in the context যে, কোর্ট-কাচারীর মধ্যে কী context এ কী অপরাধ হল সেটা হয়তো অনেকে অনুধাবন করবেন না। সেখানে হয়তো misjudgment এর একটি আশঙ্কা থেকে যেতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যেটা পরবর্তীকালে করেছে এবং যেটা নিয়ে এতদিন যাবৎ কেউ কোন উচ্চবাচ্য করেননি ... আমার মনে হয় সেটাকে যদি আর একটু সুন্দর পরিসরে implement করা যায় তাহলে সেটা সকলের জন্য সুখকর হবে। আমিও সুপ্রীম জুডিশিয়ারী কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম, চেয়ারম্যান ছিলাম এবং আমি দেখেছি যে, আমরা যেভাবে সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে খতিয়ে দেখে সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে যেভাবে করতে পারি সেটাতে কোন রকম সমস্যা হয় না। অন্যান্য সময় হয়তো অনেক কিছু হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। সুতরাং কোর্টের ব্যাপারটা কোর্টের কাছে রেখে দিলে সবচেয়ে সুখকর হবে। At the same time accountability of judges এটা থাকার খুবই গুরুত্ব আছে ... জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে তাদের চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকবে,At the same time accountability of judges থাকবে ... এটা আমার ক্ষুদ্র অভিমত।'

সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব আজমালুল হোসেন কিউসি বলেন: '... ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ ৭২-এর সংবিধানে যেভাবে ছিল সেখানেই ফেরত যেতে হবে। কারণ আমরা জানি যে, এখন administrative problem হচ্ছে। কেননা আইনের মধ্যে নেই বিধায় অনেক বদলী আটকে আছে। তাই এটাকে পরিবর্তন করে ৭২-এর অনুরূপ করার প্রয়োজন আছে ...সুপ্রীম জুডিশিয়াল সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো মতামত নাই। উভয় চলতে পারে। আপনারা জজ সাহেবদের কাছেও রাখতে পারেন। আপনারাও নিয়ে আসতে পারেন। আমার মনে হয় যে, এটা more effective check and balance হবে যদি এটা পার্লামেন্টে আসে। উভয় পন্থাই আমরা অবলম্বন করতে পারি ... কিন্তু effective check and balance যদি চান, Constitutional check and balance তাহলে ১৯৭২ এর সংবিধানে যেতে হবে। তাহলে তাদের উপর একটা চাপ থাকবে। না, somebody else going to watch this.'

অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম বলেন: '... ৯৬ এখন যেভাবে আছে, জ্যেষ্ঠ তিনজন বিচারপতি, প্রধান বিচারপতিসহ। আমি এখানে আরও তিনজনকে যুক্ত করতে চাই, অ্যাটর্নি জেনারেল, পার্লামেন্টের একজন মেম্বার, যাঁকে স্পিকার মনোনয়ন দিয়ে পাঠাবেন, আর বারের যে কোন সিনিয়র মেম্বার, তাঁকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করবেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এই ছয়জনকে নিয়ে হবে, শুধুমাত্র জজদের দিয়ে নয়। এই ছয়জনের মধ্যে যদি টাই হয়ে যায়, তিন তিন হয়ে যায়, তখন জিনিসটি পার্লামেন্টে আসবে, cognizance এখন যেভাবে হয়। এটি হচ্ছে আমার ৯৬ এর ব্যাপারে চিন্তা। ১১৬ এর ব্যাপারে যেটি আছে, সেটি হচ্ছে এই ক্ষমতাটি '৭২ সংবিধান যে রকম ছিল, সেভাবে পুনরুদ্ধার করা দরকার। কারণ বিচার বিভাগের সমস্ত ক্ষমতাটি সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকা উচিৎ, ১১৬ অরিজিনালি যেটি ছিল। এখানে অনেকেই ৯৯ সম্বন্ধে বলেছেন। আমি এতে দ্বিমত পোষণ করি ... Retirements means retirement. Retire করে আবার এক জায়গায় পেশা গ্রহণ করা, এটি ঠিক নয়। যদি নিম্ন আদালতের বিচারকদের এটি বন্ধ করা হয়, তাহলে হাইকোর্টের বিচারকদের এটি কেন চালু থাকবে? ... এভাবে ১৯৭২ সংবিধান অরিজিনাল ছিল, সেটিতে ফিরে যাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।'

বিচারপতি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে সংসদীয় বিশেষ কমিটি তার ১৬তম বৈঠকে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বিচারকের পদের মেয়াদ সাতষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত বহাল থাকার বিধানটি অক্ষুণ্ন রেখে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল বিধান পুনর্বহালের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলো সম্পর্কে কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশগুলো হলো:

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ এর প্রতিস্থাপন।– সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৯৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৯৫। বিচারক-নিয়োগ।– (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট নাথাকিয়া থাকিলে, অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে এবং অন্যূন তিন বৎসর জেলা-বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ না করিয়া থাকিলে, অথবা

(গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর প্রতিস্থাপন। - সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৯৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ।–(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল দ্বারা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত অসদাচারণ, অদক্ষতা বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অনূন্য দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাইন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লিখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিভাগ হইতে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুই জন করিয়া মোট চার জন বিচারক এবং স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুই জন সংসদ সদস্য লইয়া উক্ত কাউন্সিল গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য, দক্ষতা বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসামর্থ্য হন তাহা হইলে উক্ত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে–

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি ও দক্ষতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা; এবং

(খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন কর্মকর্তার, সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা সংসদ কিংবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক –

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচারণের জন্য দোষী হইতে পারেন; অথবা

(গ) তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষ নয়, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে এবং উহার তদন্ত ফল সংসদকে জ্ঞাত করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর সংসদের নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচারণের জন্য দোষী হইয়াছেন অথবা তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অদক্ষ, তাহা হইলে সংসদ উক্ত বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারী ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় উল্লিখিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন, উক্ত কাউন্সিল কর্তৃক কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে সংসদের প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।
(৯) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৯ এর প্রতিস্থাপন।- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৯৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-
"৯৯। বিচারকের অক্ষমতা।- (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতিত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না অথবা বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিভাগীয় পদ ব্যতিত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।
(২) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।"

সংবিধানের ১১৬ এর প্রতিস্থাপন। - সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-
"১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলা-বিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রিম কোর্টে সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ব্যরিস্টার আমীর-উল ইসলাম *ইত্তেফাক*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার একটি মীমাংসিত বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, পঞ্চম সংশোধনীর মামলায় এই ইস্যুটির নিষ্পত্তি হয়েছে। তখন সব মত ও পথের আইনজীবীরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে অভিমত দিয়েছিলেন বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে না রেখে সুপ্রিম কোর্টের হাতে রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, সংসদের হাতে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা দেওয়া হলে তা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে কি-না সেটি নিয়ে সাংবিধানিক প্রশ্ন উঠবে। আমাদের সংবিধানে ক্ষমতার পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে, তার ব্যতয় ঘটছে কি-না? অতএব আমাদের সংবিধানে তিনটি বিভাগের মধ্যে যে ভারসাম্য রয়েছে তার কোথাও বিচ্যুতি ঘটলে সব জায়গাতেই বিচ্যুতি দেখা দেবে (২০ আগস্ট ২০১৪)।

প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনী সম্পর্কে কিছু উদ্বেগ

প্রস্তাবিত ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে নাগরিকদের মনে অনেক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্বেগের একটি কারণ হলো প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রেক্ষাপট। আমাদের সংবিধান রচনাকালে বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আর বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাহাত্তরের সংবিধান রচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের রাজনীতিবিদরা সে লক্ষ্যে নিবেদিত ছিলেন। মান ও মননের দিক থেকে তখনকার রাজনীতিবিদরা অনেক বেশি উন্নত ও জনকল্যাণমুখী ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, গত ৪২ বছরে নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে এবং আমাদের রাজনীতিবিদদের মান ও মননের অনেক অবনতি ঘটেছে। আমাদের সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই এখন ব্যবসায়ী, যারা রাজনীতিকে জনকল্যাণের মাধ্যমের পরিবর্তে বহুলাংশে ব্যবসা হিসেবেই নিয়েছেন। আমাদের নির্বাচনগুলোতে টাকার সাথে সাথে পেশিশক্তির প্রভাবও প্রবল। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগতভাবে অবাঞ্ছিতদের দখলে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও পরিবারতন্ত্র ও সর্বস্তরে ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার কারণে আমাদের রাজনীতিতে মেধাবী ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতিতে বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল, আজকের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে সংসদের হাতে বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতার অপব্যবহার হবে না, তা আজ জোর দিয়ে বলা যায় না। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকার প্রধান ও সংসদ নেতা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই কার্যকর হবে। সুতরাং সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে বলেই অনেকের আশঙ্কা।

দশম জাতীয় সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে আরও একটি বড় আপত্তির কারণ রয়েছে। বর্তমান সংসদ একটি প্রায় ভোটারবিহীন একতরফা তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এর ১৫৩ জন সদস্য বস্তুত 'অনির্বাচিত' বা স্বনির্বাচিত। তাই বর্তমান সংসদের কাছে বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা প্রদানের যৌক্তিকতা দারুনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেকের মতে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি।

প্রসঙ্গত, নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের সাম্প্রতিক ঘটনার পর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ অভিযুক্ত র‍্যাবের তিন কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়, যার বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবল উষ্মা প্রকাশ করেন। তখন যদি সংসদের হাতে বিচারকদের অভিশংসন করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ওই বেঞ্চের বিচারপতিদ্বয় অভিশংসন মাধ্যমের অপসারণের হুমকীর মুখে পড়তেন বলে অনেকের ধারণা। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না নিলেও আমাদের বর্তমান মোসাহেবীপনার সংস্কৃতিতে অন্যরাই সম্ভবত অভিশংসনের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতেন। ফলে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের মত জঘন্য ঘটনা উদঘাটিত হওয়ার পথ সম্ভবত রুদ্ধ হয়ে যেত এবং বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদতো।

আমাদের দেশে বহুদিন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব চলে আসছে। বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দিলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আরও নিরঙ্কুশ হবে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি অধ্যাপক মইনুল ইসলাম লিখেছেন: 'সংবিধানের ৭০ ধারার কারণে সংসদের সরকারি দল বা জোটের সাংসদদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রধানমন্ত্রীর করতলগত রয়েছে। এই অবস্থায় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার শর্ত অন্যায়ভাবে কোনো বিচারপতির অভিশংসনের বিরুদ্ধে কোনো অর্থবহ রক্ষাকবচ হতে পারবে না, কারণ সংসদ নেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা সরকারি দল বা জোটের সাংসদদের নেই' (*প্রথম আলো*, ২৮ আগস্ট ২০১৪)।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সংসদীয় ব্যবস্থায় 'প্রিন্সিপলস অব সেপারেশন অব পাওয়ার' বা ক্ষমতার পৃথকীকরণ পদ্ধতির কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কারণ সংসদীয় পদ্ধতিতে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের বিভাজন অনেকটা কৃত্রিম। বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে প্রণীত আমাদের সংবিধানে এ ব্যবস্থা আরও বেশি দুর্বল। আর তাঁর সংসদের ওপর বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা অর্পণ করলে এ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলেই অনেকের আশঙ্কা, যা কর্তৃত্ববাদী সরকার সৃষ্টির পথকে সুগম করবে। এমনিতেই কার্যকর বিরোধী দলবিহীন সংসদ এ ধরনের কর্তৃত্ববাদ সৃষ্টির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ ইতোমধ্যেই সৃষ্টি করে রেখেছে।

একটি চরম বিতর্কিত নির্বাচনের পরপরই সংসদের কাছে বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্তকে একটি গভীর দুরভিসন্ধির অংশ হিসেবেই অনেকে দেখছেন। এর তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, যেখানে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার জন্য সংবিধানের অনেকগুলো অনুচ্ছেদে – যেমন, অনুচ্ছেদ ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১১৫ ও ১১৬ – পরিবর্তন আনা দরকার, সেখানে শুধুমাত্র ৯৬ অনুচ্ছেদে পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সরকার হস্তগত করতে চাইলেও, বিচারক নিয়োগে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা দলবাজির অবসান ঘটাতে এবং সংবিধান নির্দেশিত বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে তারা অনাগ্রহী। প্রসঙ্গত, এ ধরনের আইন অনেক দেশেই রয়েছে। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও ১৪ জন বিচারপতির চাকুরি স্থায়ীকরণ মামলায় এ ধরনের একটি আইন করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী, বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ন্যস্ত হলে অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের ক্ষমতাও তাদের করায়ত্ব হবে। ফলে সরকার সব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পাবে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তৃতীয়ত, আইন কমিশন সম্প্রতি বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এক ডজন সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদে ফিরিয়ে দেওয়ার সুপারিশও রয়েছে। কিন্তু সবগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু একটিমাত্র সুপারিশ বাস্তবায়নের সরকারি উদ্যোগ সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না।

প্রসঙ্গত, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত এবং বিচারপতিদেরকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বিচারপতিরা দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে নন। বস্তুত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবারই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হওয়া জরুরি। বিশেষত জরুরি বৈধ-অবৈধ 'সীমাহীন' ক্ষমতার অধিকারী সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। কিন্তু আমাদের বর্তমান মাননীয় সংসদ সদস্যদের একটি বিরাট অংশ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের গর্হিত ও বেআইনি কাজে লিপ্ত রয়েছেন। তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করছেন, যার মাধ্যমে 'সংসদ অবমাননা' ঘটছে। তাই বিচারপতিদের দায়বদ্ধতার আগে প্রয়োজন সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।